সুখস্মৃতি

নীলাঞ্জন শাণ্ডিল্য

'প্রিয়াংকা, প্রিয়াংকা, ও প্রিয়াংকা ... ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? নাহ্, এভাবে তো মুশকিল। এত অমনোযোগী হলে তো চলবে না। ... এ-নিয়ে এ-কথাটা কিন্তু তোমাকে বেশ কয়েকবার বলা হয়ে গেল। মনে রেখো, এটা প্রাইভেট ফার্ম, সরকারি অফিস নয়।'

পৌষ মাসের হিমে ভেজা সকালের মাঠটা আস্তে আস্তে আবছা হয়ে যেতে লাগল। ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল ঝুলো গোঁফ আর মাথায় টাক-ওলা একটা মুখ। কয়েকটা বেঁটেখাটো বাবলা, বুনো কুল আর পাকানো খেজুরের গাছ পেরিয়ে ফসল-তোলা এবড়ো-খেবড়ো মাঠটা আলপথ ধরে ধরে যেখানে আকাশে গিয়ে পড়েছে, সে জায়গাটা একটা বড়ো জামবাটির মতো; সেখানকার আকাশটা পালটিয়ে গিয়ে একটা গোলাপি দেওয়াল আর বাদামি রঙের ফাইলের দেরাজ ফুটে উঠল।

'সরি, আর হবে না স্যর। কাজটা আমার হয়েই গেছে। শুধু প্রিন্ট আউট দেওয়া বাকি।'

প্রিয়াংকা এখন বুঝতে পেরেছে, সে আর তাদের গ্রামের বাড়ির সামনের ধান-চষা মাঠটায় নেই, এখন ভোরবেলাও নয়। সে আসলে এখন অফিসে। সে তাকিয়ে আছে গোলাপি রঙের দেওয়ালের পশ্চাদ্‌পটে চেয়ারে বসে থাকা এক মধ্যবয়স্ক মানুষের দিকে — তিনি প্রিয়াংকার বস। আজ শুরু থেকেই তিনি যে ম্যাটারটার জন্য তাগাদা দিচ্ছেন, তা সে শেষ করেছে একটু আগেই। টাইপের স্পিড তার ভালোই, অন্তত আর এক কমপিউটার অপারেটর ধানুবাবুর থেকে অনেক ভালো। তার ভুলও কম হয়। আর যাই হোক, সে তো ধানুবাবুর মতো টেনেটুনে হায়ার সেকেন্ডারি নয়, সে গ্র্যাজুয়েট। ওয়ার্ড ছাড়াও এক্সেল আর পাওয়ার পয়েন্টের কাজ তার জানা আছে। তবে দুর্ভাগ্যবশত তেমন ভারী কোনো কমপিউটার ডিগ্রি নেই। থাকলে কি আর সে এই ছোটো কোম্পানিতে চারহাজার টাকা মাস মাইনেয় পড়ে থাকত। ... তবে কিনা, এ চাকরিই-বা এ-বাজারে কে দেয়।

বস তাঁর গোঁফজোড়ায় একবার হাত বুলিয়ে পকেট থেকে চশমা বার করে নাকের উপরে লাগিয়ে নিয়ে প্রিন্ট হওয়া রিপোর্টটা পড়তে শুরু করেন। প্রিয়াংকাও একটু আশ্বস্ত বোধ করে। সে আবার শুনতে পায়, তার মায়ের ঈষৎ কর্কশ গলার ডাক — 'পারভিন, পারভিন, পারভিন ... নে উঠ, আর কত ঘুমাবি। এদিকে ধুপিগুলো সব শেষ হতে চলল যে।' ধড়ফড় করে উঠে পড়ে প্রিয়াংকা।

'ঠিক আছে, খারাপ হয়নি। কারেকশনটুকু করে ছেড়ে দাও। গণেশের হাতে দিয়ে দাও চট করে, ও ক্যুরিয়ারের অফিসে বেরোচ্ছে। আবার ঘুমিয়ে পোড়ো না যেন। তিনটি চিঠি ড্রাফট করে রাখা আছে, তাড়াতাড়ি টাইপ করে ফেলো। তারপর আরও কাজ আছে।'

বোস সাহেবের এই সমস্যা। তাঁর সবসময়েই শঙ্কা, স্টাফেরা বোধহয় চুপচাপ বসে থাকছে।

মাইনে যখন পুরো দিচ্ছি, কাজও পুরো সময়েরই চাই। বিনা কাজে কারওর বসে থাকা চলবে না। যখন আর কিছু থাকে না তখন 'রিপোর্ট কমপাইল' করতে হয়। 'রিপোর্ট কমপাইলেশন' মানে হল কোনো একটা জার্নাল দেখে দেখে টাইপ করা, যেটা কোনোদিনই অফিসের কোনো কম্মে লাগবে না। তবু এমপ্লয়িদের এনগেজড তো রাখতে হবে!

তাতেও আপত্তি নেই প্রিয়াংকার। কাজ করতেই সে এসেছে, টানা কাজ করে যেতে তার কোনো ক্লান্তিও আসে না। শুধু যেদিন মন খারাপ করে থাকে, সেদিন মনটা সোদপুরের ঘিঞ্জি রাস্তায় আর এই ঘুপচি অফিস ঘরে থাকতে চায় না; থাকতে চায় না সরু গলিটার শেষে তাদের চিলতে এক ঘরের বাসায়। তার মন চলে যায় সেইসব সুখের দিনে। বিশেষ করে এই সময়টা বড়ো বেয়াড়া। অঘ্রান শেষ হয়ে পৌষ পড়তে চলল। নাকে ভেসে আসে নতুন খেজুর পাটালির সেই ঘ্রাণ, কাঠের উনুনের ওম, ধানপাতায় ভোরে জমে থাকা শীতের শিশিরের শীতল অথচ প্রাণময় স্পর্শ।

শীত আসি আসি করলেও বর্ষা যেতে যেতেও থেকে গিয়েছে এখনও। অফিস থেকে সন্ধেয় বাসায় ফেরাটা দুর্বিষহ। বাড়ির কাছের চৌরাস্তা অবদি অটো থাকলেও সাধারণত হেঁটেই ফেরে প্রিয়াংকা। কতক্ষণই-বা — মিনিট কুড়ির তো হাঁটা পথ। হাঁটাও হয়, আবার রোজ পাঁচটা করে টাকা বাঁচে। তবে সে অটোয় না চড়লেও অটোগুলো তো আর রাস্তার দখল ছাড়ে না। খানা-খন্দের উপর দিয়ে বিনা মায়ায় চালিয়ে দেয়। বড়ো রাস্তা পেরিয়ে তাদের গলিতে ঢুকলেই আর আলো নেই। দু-একটা বাড়িতে সদর দরজার সামনে ঝুল-মাখা বাল্‌বের ভিতর থেকে শূন্য ওয়াটের আলো টিমটিম করে; আর মোবাইলের আলোয় যতটা হয়। বর্ষায় একটা কাজ হল, বাড়ি ফিরে এসে চুড়িদারের পা থেকে কাদার ছিটেগুলো সাবধানে তুলে ফেলা। শুকিয়ে গেলে উঠতে চাইবে না, উঠলেও দাগ রেখে যাবে। আর পোশাকটাই তো কাল আবার পরতে হবে।

পোশাকে-আশাকে বরাবরই ফিটফাট প্রিয়াংকা। ছোটোকালেও বিকেলে কাচা কাপড় না পরলে তার চলত না। এ নিয়ে মায়ের খোঁটা খেয়েছে কত। যাক সে কথা। প্রতি মাসেই ভাবে একটা টর্চ কিনবে, আর হয়ে ওঠে না। আর, একটা কিনলে তো চলবে না, আশিস তো আরও রাতে বাড়ি ফেরে। একা বসে বসে এক এক দিন ঘুম এসে যায় প্রিয়াংকার। আশিস ফিরলে স্টোভ জ্বেলে আবার খাবার গরম করবার পালা। শক্ত হয়ে আসা রুটি চিবোতে চিবোতে তার মনে পড়ে যায় গ্রামের রাতের খাওয়ার কথা। সে একটা উৎসবের মতো। রাত ঘন হয়ে এলেই বাড়ির মেয়েরা এসে জড়ো হয়ে বসত। জ্বলে উঠত কাঠের উনুন। প্রতিদিনের চাল ঝাড়ার শেষে যে খুদ বাঁচত তা দিয়ে তৈরি হত রুটি। মায়েরা উবু হয়ে উনুনের চারদিকে গোল হয়ে বসত, তাদের পাশে-পেছনে কচি-কাঁচারা। উনুনের ওমে জাড় কাটত, গরম পোশাক তেমন না হলেও চলে যেত।

তাড়াতাড়ি স্কুলের পড়া সেরে প্রিয়াংকা দৌড়ে চলে আসত এই আড্ডায়। বাবার কাছে কত বকুনি খেয়েছে, পড়ায় ফাঁকি দেওয়ার জন্য। আর সে কী মজার আড্ডা। পাড়ার যত ঘটনা-কেচ্ছা, যত সুখ-দুঃখের চাপা কাহিনি, সব প্রকাশিত হত এখানে, যেমন গরম কড়ায় জমা ডালডা দিয়ে

দিলে তা আস্তে আস্তে গলে তেল হয়ে ওঠে, তেমনি। রমজান মাসে এফতারের সময় যখন তেলে খাবার ভাজা হত, তখনও সে মন দিয়ে দেখত এই ডালডার গলে ওঠা। সেও ভারি মজা ছিল। শেষ রাতে উঠে মা-ফুফিরা রাঁধতে লেগে যেত। ইদের দিনেও খুদের রুটি হত, সেদিন খাওয়া হত গোস্ত দিয়ে। আর এমনি দিনে খুব ঝাল একটা টক দিয়ে। কী ভালো যে লাগত, নাক-মুখ দিয়ে আগুনের মতো ভাপ বেরোত আর জল গড়াত। খুদের গুঁড়ো গরম জলে মেখে নিলে, তা দিয়ে হাতের চাপড়ে চাপড়ে কী সুন্দর গোল হয়ে উঠত রুটিগুলো, তা এই শহরে কেউ পারবে? আর সেই গোল হয়ে বসে আগুন পোহাতে পোহাতে খাওয়া, তার তুলনা হয় আর কিছুর সঙ্গে? খাওয়া শেষ হলে সকড়ি থালা-বাটি মেজে নেয়। কালও সকাল সকাল বেরোতে হবে। এই ফাঁকে বিছানাটা করে নেয় আশিস। শোওয়ার আগে চৌকিতে দুজনে পাশাপাশি বসে একটুক্ষণ। আশিস বলে, 'তোমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে প্রিয়াংকা। আর বেশিদিন নয়, দেখো একটা কিছু হবেই। আমি ঠিক জানি।' এসব কথায় আর আশা দোলে না তার মনে। তবু কেন যেন মনটা ভালো হয়ে যায় পারভিনের। দুজনে শুয়ে পড়ে। কাল সকাল থেকে আবার বাঁচার লড়াই।

দূরের তালগাছগুলোর মাথায় সূর্য এখনও উঁকি দেয়নি। মা-ফুফিরা সব ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। আগের দিনের ভিজিয়ে শুকনো করা চাল বেটে নিচ্ছে তারা। গুঁড়ো চাল অনবরত হাতে করে নাড়াচাড়া করতে হয়, নইলে হিমে জমে সেগুলো তাল পাকিয়ে যাবে। পাত্রের চাল নড়ছে-চড়ছে আর দিব্যি চলছে গল্পগাছা। মাঝে মাঝে টুপ টুপ করে হিম ঝরে পড়ছে। ইতোমধ্যে কাঠের উনুনে আঁচ গনগনিয়ে উঠল, বড়ো জল-ভরা হাঁড়িটা বসিয়ে দেওয়া হল। হাঁড়ির উপরে ফুটোওয়ালা সরা, যাতে বাষ্প বেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু গরম জল না উপচে পড়ে যায়। গরম জলের খুব তেজ। সে সরাকে ঠেলে সরিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে, তাই মাখা আটা দিয়ে সরাটা হাঁড়ির মুখের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। জল ফুটে উঠলে খুরিতে চালের গুঁড়ো ঢালা হয়। অর্ধেক ভর্তি হয়ে গেলে ছড়িয়ে দেওয়া হয় নতুন খেজুর গুড়ের পাটালির কয়েকটা টুকরো। তার উপর আবার চালের গুঁড়ো দিয়ে পুরোটা খুরি ভর্তি করে গরম জলের হাঁড়ির সরার উপরে বসানো হয়। গরম বাষ্পে ধুপি তৈরি হতে থাকে। যখন সুঘ্রাণ বেরোয় তখন নামিয়ে নিয়ে ঝুড়িতে রাখা হয়। মেয়েরা হাঁড়িতে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ফেরি করতে বেরোয়। কিছু অবশ্য থেকে যায় বাড়ির লোকেদের জন্য। অল্প নুন মাখিয়ে খেতে হয় ধুপি। কী সোয়াদ, মুখে যখন গলে যাওয়া পাটালি পড়ে, মন ভরে যায়। কেন যে শহরের লোকে নলেন গুড়ের জলভরা সন্দেশের এত প্রশংসা করে — কীসে আর কীসে। একবার মুখে পড়লে মনটা যেন সারাদিনের জন্য ভালো হয়ে যায়।

মুশকিল একটাই, ঝপাঝপ সব শেষ হয়ে যায়। কতদিন হয়েছে, মায়ের ডাক শুনেও যেদিন শীতের আরামের ঘুমটা ভাঙতে একটুকু দেরি হয়ে গেছে, সেদিন সব শেষ। যেদিন সকালে পারভিনের ধুপি জোটেনি, সেদিনকার দিনটা যেন একটা তেতো দিন। সেদিন মায়ের বকুনি আরও ঝাঁঝালো 'সারাদিনে একখান খ্যাড় কেটেও তো দু-খান করলি না।'

কোনোদিনই তা করত না সে। তবে ভোরবেলা বাবার সঙ্গে মাঠে যেতে বড়ো ভালো লাগত তার। ওই তো সামনেই, যেখানে ধুপি তৈরি হচ্ছে, সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। তাদের

নিজেদের জমি। বাবা নিজের হাতে চাষ করত, এখনও করে। তবে, বাবার বয়েস হচ্ছে, এখন ভায়েরাও হাত লাগায়। সে বড়ো হওয়ার পর মা আর যেতে দিত না। বড়ো মেয়েদের ওরকম উটকোপনা করে খেতে যেতে নেই। স্কুলে-কলেজে যেতে কিন্তু কোনো বারণ ছিল না। মা পুকুরপাড়ে গেলে সেই ফাঁকে এক-আধদিন ছুট্টে ঘুরে এসেছে সে। নতুন চষা মাটির উপর খালি পায়ে হাঁটবার মজাই আলাদা। বাবা কিছু বলত না। কিন্তু মা ঠিক ধরে ফেলত। মাথার পেছনেও বুঝি একজোড়া চোখ লাগানো ছিল মায়ের — 'হা রে, কুনথে গিয়েছিলা, কথা শুনিস না?' বলে পিঠে বসিয়ে দিত এক ঘা।

কী ভালোই যে লাগত খেতে যেতে। যখন যেতে বাধ্য ছিল না, তখন গরম গরম ধুপি খেয়ে শীতের জড়তাটা একটু কাটলেই একটা চাদর জড়িয়ে বাবার হাত ধরে বেরোত। বাবা বলত, 'নাক আর কান ঢেকে রাখ ভালো করে, ওই ফুটো দিয়েই ঠান্ডা ঢোকে শরীলে।'

সবকিছুই কেমন বদলিয়ে যায়। তাদের গ্রাম বদলপুর যেমন পালটিয়ে গিয়েছে, যেমন আরও পালটে যাচ্ছে প্রতিদিনই। পালটিয়ে গিয়েছে তার বাড়ি, বাড়ির লোকজন, সে নিজেও। এই সেদিন মনে হয়, যেদিন স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হল। তাদের গ্রামের হাইস্কুলও কো-এডুকেশনাল ছিল, তাই তার কলেজে মানিয়ে নিতে তেমন অসুবিধে হয়নি।

আশিস কিন্তু বরাবর বয়েজ স্কুলে পড়েছে। নদিয়ার তেহট্ট ব্লকে তাদের বাড়ি। তখন বহরমপুরে এক দুর সম্পর্কের মামার বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ছে সে। অনাদরের থাকা। আসার সময় কোনোদিন খাবার জোটে তো কোনোদিন জোটে না। কিন্তু এসব নিয়ে মন খারাপ হওয়ার ছেলে সে নয়। সবকিছুর মধ্যেই ভালোটা খুঁজে বের করা তার এক জেদ। তার দোহারা শ্যামলা চেহারায় একটা আশার আলো যেন সবসময় সেঁটে থাকে।

একমাস যেতে না যেতেই একটা আলাদা অনুভূতি টের পাচ্ছিল পারভিন, একটা কি টান। ছুটির দিনগুলো আর ভালো লাগে না, বাড়িতে মন বসে না। অনেক কান্নাকাটি করে ফি-রবিবার বহরমপুরে একটা টিউশন নিল সে। পড়া না ছাই। আসল উদ্দেশ্য আশিসের সঙ্গে দেখা হওয়া। টিউশন পড়ত না আশিস — কলেজের মাইনে মেটানোই কঠিন তার পক্ষে, তার উপর টিউশন ফি তো অসম্ভব। টিউশন স্যারের বাড়ির গলির মুখে একটু আড়ালে দাঁড়াত সে। ফিরতি পথে পারভিনের সঙ্গ নিত। পাশাপাশি সাইকেলে যেতে যেতে কত গল্প হত। মাঝে মাঝে আশিস চলে যেত গ্রামের মুখ পর্যন্ত। বহরমপুরে ফিরতে অনেক রাত হত আশিসের। মোবাইল তো তখন তাদের ছিল না।

প্রথম প্রথম নিজের কথা বলতই না মুখচোরা ছেলেটা, পারভিনের বকবকানি শুনত আর হুঁ-হ্যাঁ করত। পরের দিকে অবশ্য আড় ভেঙেছিল। কষ্টের জীবন ছেলেটার। মা যখন হঠাৎ মারা যায় তখন তার সাতবছর বয়েস। বছর ঘুরতে বাবা ফের বিয়ে করে। সৎ মায়ের আদর কোনোদিনই পায়নি। তবে অত্যাচার শুরু হল, যখন একে একে তিনভাই জন্ম নিল। সহ্যের সীমা ছাড়ালে পালিয়ে এল বহরমপুরে, মামার বাড়িতে। এখানেও আদর-ভালোবাসা নেই, তবে লাথি-ঝাঁটাও নেই। স্বপ্ন দেখত ছেলেটা। বড়ো কিছু করবে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে, অর্থের অভাব আর থাকবে না। একদিন নিজের অজান্তেই পারভিন কখন যেন আশিসের স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আর

বেরোনোর পথ পায় না। 'দেখো, একটা কিছু হবেই।' — এই একই কথা শুনতে শুনতে কখন যেন বিশ্বাস করে ফেলেছিল। আজও নিশ্বাসে সেই বিশ্বাসের রেশ টেনে চলছে। কথাগুলো এখন ফিকে লাগে, তবুও পুরোটা উড়িয়ে দিতে পারে না।

পালিয়ে বিয়ে তাদের। বাপ-মা রাজি হত না কিছুতেই। নইলে আশিস তো চেয়েছিল জানিয়েই সবকিছু হোক। বিয়ের পর গা ঢাকা দিয়ে কলকাতায়। খবর পেয়ে বাবা কিছু বলেনি, চুপ করে ছিল চাপা মানুষটা। মা আফশোস করেছিল মেয়েটা বংশের ইজ্জত রাখল না। তাদের অবস্থা ভালো না হলেও এত খারাপ নয় যে একমাত্র মেয়েকে একটা হাঘরের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। এসব ভাইয়ের কাছে শোনা।

সকাল সকাল বেরোত আশিস, ফিরত রাত করে ক্লান্ত হতাশ মুখ নিয়ে। 'আজও কিছু হল না।'

'দেখো হবে, একটা কিছু হবেই।'

আশিসের কথাই তাকে শোনাত প্রিয়াংকা। ওই কটা মাস যে কী করে কেটেছে! তার পরে আশিসের একটা ছোটো চাকরি জুটলে দুরুদুরু বুকে প্রথমবার বাড়ি যাওয়া। রাতে থেকে আসবার কথা ভেবেই তারা পৌঁছেছিল দুপুরের দিকে। তখন খাওয়া-দাওয়ার পাট শেষ। আগে থেকে চিঠিতে, টেলিফোনে সব জানানোর পর বাবার অনুরোধেই যাওয়া। চেনাদের বড়ো অচেনা ঠেকল সেদিন। তার মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল। তাদের চোখেমুখে কী যেন ছিল, তার বুকের ভিতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছিল একটা অজানা ভয়ে। হঠাৎ সন্ধেয় ফেরার কথা শুনে অবাক হয়েছিল আশিস, কিন্তু তখন কিছু বলেনি। শীতের রাতটা বহরমপুর কোর্ট স্টেশনেই কাটিয়ে দিল দুজনে। পরের দিন আশিস জানতে চাইলে তার এ হেন আচরণের জবাবদিহি করতে পারেনি পারভিন। দিনের আলোয় সন্ধের আশঙ্কাগুলো অবান্তর বলেই মনে হয়েছিল।

কথাবার্তা ভালোই এগোচ্ছিল গোড়ায়। বাবা বলল বিয়ে হয়েই গেছে যখন, তারা মেনে নিতে রাজি আছে, যদি সব ঠিকমতো চলে। ঠিকমতো মানে? এ গ্রামেই থাকতে হবে, বাইরে থাকা চলবে না। ঘর তুলে দেওয়া, চাষের জমি-জিরেতের বন্দোবস্ত করে দেওয়া — আশিসও তো চাষারই ছেলে — এ সব গ্রামের দায়িত্ব। আশিস এই সহজ সমাধানে শান্তভাবে অসম্মতি জানাল। তার স্বপ্ন তাকে বাধা দিল। বড়ো করুণ চোখ করে তার দিকে একবার তাকাল আশিস। সেই আকুতি ভরা দৃষ্টি গোরে যাওয়ার সময়ও ভুলতে পারবে না পারভিন। আর তার পরেই মুরুব্বিদের চাহনি। বিশেষ করে করিম চাচার চোখে চোখ পড়তেই পারভিনের খুন ঠান্ডা হয়ে এল যেন। মা পাশেই বসেছিল উবু হয়ে। ফিসফিস করে উঠল — 'জামায়ের ফুটানি দেখ দিখি। এক পয়সার মুরোদ নাই, চাঁদ ধরবারে যায়। এই মেয়ে, তোর বালাখান গেল কুনথে?'

লম্ফের আলোতেও আশিসের শ্যামলা মুখখান লাল হয়ে উঠল।

পারভিন তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'বাবা! রাস্তাঘাটের যা অবস্থা আজকাল! সোনার গয়না পরে এতদূর আসা যায়?'

ওই একগাছি বালা আর দু-পাটি দুল তাকে মা কিনে দিয়েছিল মাধ্যমিকের পর একটা আর

বি কম পাস করলে একটা। পারভিন এ গ্রামের প্রথম গ্র্যাজুয়েট মেয়ে। সোদপুরের বাসায় ফিরে ঠান্ডা লেগে জ্বর হল তার। আশিস সারারাত পাশে বসে, কপালে জলপটি লাগিয়ে, হাওয়া করেছিল। পরদিন ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে অফিসে বেরোল বেচারি।

ধান রুইবার মতো ভালো কাজ আর আছে নাকি? ফসলের আগের কয়েক মাস কষ্টেই চলত। তবু বীজ ফোটানোর সময় এলেই মন ভালো হয়ে যেত। বীজের জন্য তুলে রাখা ধান ভিজিয়ে নিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হত। প্রথমে কুঁড়োর আস্তরণ, তার উপরে খড়, তারও উপর প্লাস্টিক বিছিয়ে দিতে হয়। ঠিক যেন জোদ্দার গিন্নি জোদ্দারবাবুর জন্য গদি-তোশক পেতে মখমলের চাদর বিছিয়ে দিলেন। তারই উপর ভিজে ধান ছড়িয়ে দেওয়া। তারও উপরে বালাপোশের ঢাকার মতো আর একটি প্লাস্টিক পেতে দেওয়া। বীজ থেকে কলা বেরোলে যে আনন্দ তার তুলনা নেই। হলুদে সবুজে ধানগুলির রূপ খুলে ওঠে; তেমনি মিঠে গন্ধ ফুটে ওঠে। এর মধ্যে মাটি ঝুরঝুরে করে তৈরি করে রাখতে হয়। রোদ খাইয়ে নিতে হয়।

কোদাল হাতে রোজ দেখতে যেত বাবা। সে পিছু নিলে, পিছনে না-তাকিয়েই হাতের ছাতাটা ধরিয়ে দিত। বলত, 'ছাতাটা ফোটাও মা, মাথায় দাও। রোদে পুড়ে রং কালি হলে বিয়ে হবে না।'

'বাবা, তুমি না!' — কপট লজ্জায় বলে উঠত সে।

বীজতলায় অঙ্কুরিত ধানগুলি ছড়িয়ে দেওয়া হত। জল বেশি হলেও হবে না, কম হলেও নয়। ধানের চারা বেরোনোর অল্পদিন পরে তৈরি সবুজ চারাগুলো তুলে, সাবধানে খেতে পুঁততে হত। ধানগাছের এই ফিরে পোঁতা, ঠিক যেন মেয়েদের বিয়ে-সাদি। বাপের বাড়ির নরম বীজতলার থেকে চিরতরে তাদের তুলে নেওয়া হয়, তারপর পোঁতা হয় নতুন মাটিতে।

এবার সাবধান হল পারভিন, পুজোর দু-দিনের ছুটিতে দ্বিতীয়বার দেশে চলল তারা। দুজনে মিলে কত কষ্ট করে টাকা জমিয়ে নতুন বালাটা কিনেছিল। আগেরটার চেয়ে ভারী, আর সুন্দর কাজ করা। মায়ের সামনে বসে কতবার যে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কথা বলল, তবু যেন মা-র চোখে পড়ল না। শেষে লজ্জার মাথা খেয়ে সে বলেই ফেলল, 'বালাখান কেমন হয়েছে মা? তোমার জামাই দিয়েছে।'

'হঃ। ঠিকই বুঝছিলাম। ওইটা তোরা আগেই বেচে দিয়েছিলা।'

'না না, তা কেন,' পারভিন করুণ গলায় বলে ওঠে, 'ওটা তো রয়েইছে। এটা নতুন বলে এখন পরছি।'

আর কথাবার্তা তেমন জমে না মা-মেয়ের। ওঠার সময় চাচা আবার মনে করিয়ে দেয় যে গতদিনের প্রস্তাবটা যেন ভেবে তাদের তাড়াতাড়ি জানায়। নইলে অতদূর থেকে কষ্ট করে আর আসার দরকার নেই।

পারভিন বলতে যায়, যে তারা তো করিম চাচার বাড়ি আসেনি, এসেছে তার নিজের বাড়িতে। বলতে গিয়ে কথা আটকে যায় — আড়চোখে দেখে বাবা, মা দুজনেই কান্না আটকাতে মুখ ফিরিয়ে নিল, আশিসের মুখ পাথরের মতো স্থির। বহরমপুর থেকে ভাড়া করে আনা সাইকেলে ফিরতে ফিরতে পারভিন বলে, 'এই শেষ, আর নয়। আর আসব না এখানে।'

'আহা, তা কেন। দেখো একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। একটু সময় দাও না ওদের।'

'সেদিনটা কবে? কতদিন আর বাকি আছে তার?' রোগা হয়ে আসা পারভিনের হাতে ঢলঢল করা বালাটা শেষ রোদে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। দু-পাশের সবুজ খেত চিরে চলা সরু পিচ-রাস্তায় সাইকেল দাঁড় করায় পারভিন। দূরে তাদের গ্রাম বদলপুর সুন্দর ছবির মতো দেখায়।

'এভাবে চলতে চলতে আমরা তো একদিন ফুরিয়ে যাব, যেমন প্রতিমাসেই কুড়ি তারিখ নাগাদ ফুরিয়ে যায় মাস মাইনের টাকা।'

'বিশ্বাস রাখো, সেদিন আসবেই একদিন; হয়তো শিগগিরি, হয়তো-বা কিছুদিন বাদে। কিন্তু আসবেই, দেখো। এরকম চিরকাল চলতে পারে না।'

আদিগন্ত মাঠে সন্ধ্যা নামে। আকাশ লাল করে দিয়ে দিকচক্রবালে সূর্য এসে বসে। কী সুন্দর! আবার মন ভালো হয়ে ওঠে পারভিনের। আশিস তার পাশটিতে দাঁড়ায়। বলে, 'এই যে সূর্য ডুবে যাচ্ছে, একি একেবারে শেষ হয়ে যাচ্ছে? অন্ধকার রাত কেটে গেলেই আবার নতুন দিন, সূর্য আবার উঠবেন পুবদিকে। অমাবস্যায় চাঁদ ফুরিয়ে যায় না, আবার প্রতিপদ থেকে লড়াই শুরু করে পূর্ণিমায় পৌঁছোয়।'

পারভিনের হঠাৎ মনে পড়ে তাদের বাড়িতে গাই গোরুটার বিয়োনোর কথা। কয়েকবার টলমল করে বাছুরটা কেমন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল, সেই সুখস্মৃতির কথা। সে গভীর আশ্লেষে জড়িয়ে ধরে আশিসকে।

অস্ত সূর্যের মাঠে দীর্ঘ ছায়া ফেলে দুটি নতুন মানুষ আর দুটি পুরোনো সাইকেল দাঁড়িয়ে থাকে, নিশ্চুপে। বিস্তৃত মাঠটাও চুপ, নতুন ভোরের অপেক্ষায়।